Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চর্যাপদের সমাজ-অভিজ্ঞান : ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের আখ্যান

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	চঞ্চল কুমার বোস
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.1
Pages	1-14
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চর্যাপদের সমাজ-অভিজ্ঞান : ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের আখ্যান

চঞ্চল কুমার বোস*

সারসংক্ষেপ : সময় ও সমাজচৈতন্যের অঙ্গীকারে চর্যাপদ প্রাতিস্বিক। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মমতের আঙ্গিকে এটি রচিত কিন্তু ইতিহাসের অমূল্য প্রত্নছাঁচ এতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ও শিল্পের ভাষ্যকে অগ্রাহ্য করে চর্যাপদে প্রবল হয়ে উঠেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধারণা। কায়েমি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রিচুয়ালস নয়, চর্যাপদ স্বতন্ত্র এর দেশজ স্বরের প্রকাশে। বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্য-উপনিবেশবিরোধী এই প্রতিস্পর্ধী অভিজ্ঞানকেই সন্ধান করা হয়েছে বক্ষ্যমান নিবন্ধে।

সমাজবিকাশের ইতিহাসে শ্রেণিদ্বন্দ্বের উপস্থিতি অনিবার্য। বর্ণ-বর্গ ও লৈঙ্গিক সংঘাতে সমাজকাঠামোর আভ্যন্তর রূপ বদলে যায় প্রতিনিয়ত। বৈষম্যনির্ভর সমাজপরিকাঠামোয় উচ্চবর্গ অর্থনৈতিক সম্পর্ককেই কেবল নিয়ন্ত্রণ করে না, একইসঙ্গে তারা চিন্তা-দর্শন ও মতাদর্শের ক্ষেত্রেও উপস্থিত করে আধিপত্যবাদী আকল্প। উন্নাসিক ক্ষমতাধর শ্রেণির পাশে ন্যুব্জ শ্রীহীন মানুষের ঠাঁই সচরাচর মেলে না। ইতিহাসের পটে ছড়িয়ে রয়েছে অনিবার্য নিষ্ঠুর এই সত্য। উজ্জ্বল আলোর বৃত্তে কখনোই প্রবেশের অধিকার রাখেনি সেইসব প্রাকৃত নরনারী। ফলে গোপন দুঃখ নিয়ে তাদের দূরে দূরে থাকতে হয়, কথা বলতে হয় কোমল ভীত স্বরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এবং ইনিয়ে বিনিয়ে। এই পরোক্ষ নিচু স্বর এবং প্রাকৃতজনের নীরব বিষাদে আর্দ্র সহজিয়া চর্যালোক। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের রচনাকাল সাধারণভাবে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বলে মনে করা হয়।

চর্যাপদের গীতিকাগুলোর অভ্যন্তরে নিহিত রয়েছে একধরনের প্রবল উপনিবেশ-উত্তর চেতনা। চর্যাপদ মূলত রচিত হয় সেন শাসনামলে। "সেনরাজগণের পূর্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাটদেশের অধিবাসী ছিলেন।' (রমেশচন্দ্র, ১৯৯২ : ১৩৩)

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০।

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশ থেকে আগত সেনবংশীয়রা এদেশে ঔপনিবেশিক শাসকদের মতোই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। অভিজাত সেনদের রাষ্ট্রক্ষমতার উত্তাপে বিবরে আশ্রয় নেয়া এদেশের ব্রাত্য নরনারী গড়ে তোলে প্রান্তিক জনবৃত্ত; প্রস্ফুট হয় কেন্দ্র-পরিধির টানাপড়েন। চর্যাপদগুলো লেখা হয়েছে সেনদের শাসনামলে। বৌদ্ধসহজিয়াদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের গীতিময় প্রকাশে চর্যাপদের জগৎ উজ্জ্বল কিন্তু মৃত্তিকালগ্ন মানুষের এই কৌম বিশ্বাস অবাধ সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। আর তার কারণ সেনদের উন্নাসিক আভিজাত্য, আর্যের দাম্ভিক রুচি। দেহের সাধনাই বৌদ্ধ সহজিয়াদের পরমার্থ লাভের উপায়। এই পরমার্থ অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় তান্ত্রিক আচারকে তারা অবলম্বন করে। করুণা ও আনন্দের সহজাত বোধই সহজিয়াদের সাধনার প্রধান ভিত্তি। বাংলার লোকায়ত জীবনে তান্ত্রিকতার উপস্থিতি সহজাত ব্যাপার হলেও আর্যদের কাছে তা ছিল ঘৃণার বিষয়। বহিরাগত সেনদের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার ছায়া, ফলে বেদকেন্দ্রিক তাঁদের ধর্ম ও জ্ঞানরাজ্য মূলত একবাচনিক। এলিট এই সেনদের কাছে তাঁদের সংস্কৃতি ও জ্ঞানই হলো একমাত্র সংস্কৃতি ও জ্ঞান। তাঁদের জ্ঞানজাগতিক বিশ্বে তাঁরাই প্রভু এবং প্রভুর সংস্কৃতিই সবার সংস্কৃতি। এই জগতে অন্য কারো উপস্থিতি মেনে নিতে রাজি নন তারা। 'অপরদের' বলে কোনো কিছু তাঁদের ধারণা ও পছন্দের বাইরে। এই ঔপনিবেশিক জ্ঞানরাজ্যে নিচু শ্রেণির মানুষের ঠাঁই কাম্য নয়।

সমগ্র চর্যাপদে ছড়িয়ে আছে এক প্রত্যাখ্যানবাদী মনোভাব (Theory of Negation), ছড়িয়ে আছে এক অস্ফুট ক্ষোভ আর বেদনা। এই বেদনার ভারে মেদুর চর্যাপদের বিশ্ব। লুইপা নিজের জীবনেই সেই গভীর যন্ত্রণার দাগ খুঁজে পান। উচ্চবর্গীয় জীবনে প্রবেশাধিকার নেই বলে দেহের বিলুপ্তি ও নশ্বরতাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। আলোকময় জগৎ নয়, সমাধির ছবি তাঁর চোখে ভাসে। লুইপা যেমন বলেন :

> সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
>
> সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই।(মাহবুবুল, ২০০৯ : ১৫)

জীবন নয়, মৃত্যুই তাঁর মোক্ষ। সুখ-দুঃখে মৃত্যু হবে – এই চিরচেনা সত্যকে এতো মহিয়ান করে দেখারই বা কী আছে? ব্রাহ্মণ্য রচনায় ভোগ-উল্লাস আর জীবনের কথা ছড়িয়ে থাকলেও লুইপা সমাধির স্তুতি করেন কেন? উচ্চবর্গের কাছে প্রাকৃতের স্বর কখনোই পৌঁছায় না যদি না সেই সমাজ সমতাভিত্তিক হয়। লুইপাও জানেন ধ্যানমগ্নতায় কামনা-বাসনার নিবৃত্তি হয় না, সহজানন্দ পেতে হলে শূন্যতার পথে যেতে হবে, বেছে নিতে হবে বাসনানিবৃত্তির পথ। বস্তুবিবিক্তির এই নিগ্রহ ও বঞ্চনার মধ্যে লুইপা নিম্নবর্গের গোত্রে নিজেকে যুক্ত করে নেন।

অভিজাত ব্রাহ্মণ্যশ্রেণি এবং বৌদ্ধিক গোষ্ঠী তৈরি করেছে এক গৌণ প্রতিবিম্ব, সৃষ্টি করেছে বিকল্প প্রতিচ্ছায়া। এই বিকল্প ছায়া-মানবের চেতনা ও ভাষা বোঝার ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনোটিই তাদের নেই। নির্জিত নরনারী সুযোগ পেলে নিজের কথা বলতে

পারে, উচ্চকণ্ঠে তুলে ধরতে পারে তাদের স্বর – মার্কস কিংবা মিশেল ফুকো তেমনই বলে থাকেন। কিন্তু সেই সুযোগ তারা কতোটুকু পায় অথবা স্টাবলিশমেন্ট সেই সুযোগ দিবেই বা কেন? উচ্চবর্গের বিশ্বকেই যারা সর্বজনীন বলে মনে করে তারা অন্যকে স্পেস বা আয়তন ছেড়ে দেয় না। বাংলার এই মাটি, এই ভূগোল বহিরাগত সেনদের কাছে উপনিবেশের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপ যেমন নিজের কৃষ্টি-ভাষা-সংস্কৃতিকেই বিশ্বজনীনতার সমার্থক মনে করে তেমনি গর্বিত সেনদের কাছে মানুষ-মৃত্তিকা ছায়ামাত্র। কলোনিয়াল ডিসকোর্স অধস্তনের ভাব-ভাষা-স্বরকে চেপে রাখে। তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে :

> উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ স্বভাবে প্রতিবাদী এবং বিনির্মাণপন্থী। জীবনে-সংস্কৃতিতে-সাহিত্যে-সমাজের নানা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অভ্যাসে যত ধরনের আধিপত্যপ্রবণ প্রতিবেদন গড়ে উঠেছে, তাদের বিপ্রতীপে কোথায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে নৈঃশব্দ্যের আয়তন, তা আবিষ্কার করা এবং অনুপস্থিত অস্তিত্বকে বাঙ্ময় করে তোলা এর প্রধান লক্ষ্য। (তপোধীর, ১৯৯৭ : ১৩২)

ঔপনিবেশিক জ্ঞানবিশ্ব উদ্দেশ্যমূলকভাবেই একবাচনিক। বেদগর্বী ব্রাহ্মণ্যদের কাছে বেদবহির্ভূত আচার-বিশ্বাস-সংস্কার ও ভাষা-সংস্কৃতিমাত্রই অপাঙ্‌ক্তেয়। ধর্ম-সংস্কৃতি-ভাষার পাশাপাশি বস্তু-সম্পদকেও গ্রাস করে চর্যাপদের সমাজ দানবীয় মকররূপ ধারণ করেছে। তৈরি হয় নক্র-উপাখ্যান। কুক্কুরীপা দুধ দোহন করে পাত্রে রাখার আগেই কে বা কারা তা লুণ্ঠন করে, ওভাগ করে, সম্পদের ওপর ব্যক্তির প্রাপ্যতা ও ন্যায্যতা নেই বলে গাছের তেঁতুলও কুমিরে খেয়ে যায়। সময় ও সমাজ কতোটা বিরূপ অদ্ভুত ও অসঙ্গত হলে জলের কুমির গাছের তেঁতুল খেয়ে নেয় সেটা চর্যাকারেরা মেটাফোরে রূপ দিয়েছেন। বৈরী সময়ে উৎপাদিত সম্পদ মকররূপী রাষ্ট্রীয় শোষকদের হাতে চলে যাচ্ছে। এমনকি পুরুষ নিজেই নিজেকে সম্পদ মনে করতে শুরু করে, সম্পদভোগী পুরুষতন্ত্র আরামে নিদ্রা যায় আর নিদ্রাহীন বধূ জেগে থেকে গৃহ পাহারা দেয়। উচ্চবর্গের ইতিহাসে নারীর অস্তিত্ব ও অধিকার ছায়ার মতো গৌণ। অধস্তন বাস্তবতায় নিপতিত নারীর মৌলিক সত্তার স্বীকৃতি নেই বলে তার দেহ ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির কাছে উপভোগ্য কিন্তু নারীর মানবীয় আকাঙ্ক্ষা ভূলুণ্ঠিত। এই চূড়ান্ত স্বার্থবাদী উপভৌগিক সমাজ-আঙ্গিক উঠে এসেছে সহজিয়াদের পদে :

> দুলি দুহি পীঢ়া ধরণ না জাই।
> রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই ॥
> আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
> কানেট চোরে নিল অধরাতী ॥
> সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।
> কানেট চোরে নিল কা গই মাগই ॥ (চর্যা ২)

ঔপনিবেশিক রাজনীতির এক গভীর সঙ্কেত লুকিয়ে আছে চর্যাপদে, তত্ত্বগতভাবে এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের মেরুকরণে। প্রাচ্য তথা ভারতীয় ভূভাগ প্রাচীনকাল থেকেই তন্ত্রমন্ত্রের দেশ। তান্ত্রিক আচারপ্রথা মিশে আছে মাটিতে-রক্তে-শিরায়। ব্রাহ্মণ্যরা অবজ্ঞা করে এই তান্ত্রিক আচারকে। অথচ চর্যাপদের কবিতার জগতে নিম্নশ্রেণির মানুষের ভিড়। হাড়ি-ডোম-চণ্ডাল-নিষাদ-কাপালিক-যোগীরাই এই ভুবনের বাসিন্দা। এরা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাদের অনার্য পিতামহদের। ফলে পৌরাণিক বৈদিক আর্য মত ও বিশ্বাস থেকে তারা দূরবর্তী। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকরা প্রতিষ্ঠানবিরোধী। প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বরে তাদের গভীর অবিশ্বাস। ভারতের লোকায়ত বস্তুবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস অঙ্গাঙ্গী। কলোনিয়াল ব্রাহ্মণ্যশক্তি এই মাটির সংহিতাকে প্রত্যাখ্যান করে, চাপিয়ে দেয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের নিজস্ব নিরিখ। বৌদ্ধ সহজিয়াদের কাছে দেহই প্রধান, মনই ঈশ্বর। তাই পুরাণ-বেদ-আগম নিয়ে তাদের কৌতূহল নেই :

জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥
কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক চান্দ জমি সাচ ন মিচ্ছা ॥ (চর্যা ২৯)

যে অদৃশ্য সত্তার রূপ নেই, চিহ্ন নেই, বর্ণ নেই তাকে কীভাবে বেদে-আগমে ব্যাখ্যা করা হয় সে বিস্ময় কেবল লুইপার নয়, মাটির স্পর্শে থাকা প্রতিটি প্রাকৃতজনের। জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ যেমন অধরা মায়া, ব্রাহ্মণ্যের পুরাণ-আগম-বেদও তেমনি। বেদাচারের দ্বারা এমন এক অভিজাত মহাসন্দর্ভ রচনা করেছে যা দিয়ে তারা অস্পৃশ্য নরনারী ও তাদের ধর্ম-সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে। প্রাকৃতজনের বশ্যতা চায় তারা, তাদের ওপর কায়েম করতে চায় ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক হেজিমনি। ব্রাহ্মণ্যশক্তির কাছে বেদ-আগম হলো ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স, এরা উপনিবেশিতের স্বর শুনতে চায় না। লুইপার উচ্চারণে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের যে স্বরটি ফুটেছে সেটি প্রতিরোধের ভাষা, সেটিই উপনিবেশ-উত্তর চেতনা। প্রতিরোধের এই চেতনা জেগে ওঠে বলেই ঊর্ধ্বতনের ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া যায়। যেমনটি দিয়েছে কম্বলাম্বরপা :

বাহু তু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই কইসে ॥ (চর্যা ৮)

অনেক স্বপ্ন-সাধ নিয়ে কামলি গগন-উদ্দেশে নৌকা নিয়ে যাত্রা করেছেন কিন্তু বিগত জন্ম ফিরে আসবে কীভাবে? বেদকেন্দ্রিক আর্য ধর্মবিশ্বাসে পূর্বজন্মের অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হলেও কম্বলপা সহজ যুক্তিতেই প্রত্যাখ্যান করেন এই মিথকে।

প্রত্যাখ্যানের এই ভঙ্গিমার কারণেই সহজিয়াদের এথিকস্ হৃদয়চালিত, চিত্তই পাপপুণ্যের নিয়ামক। সিদ্ধাদের এই মনোভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় উচ্চবর্গীয়ের ধর্মীয়-নান্দনিক ও মতাদর্শিক প্রতিবেদন। মন্ত্র-তন্ত্র-ধ্যান-ব্যাখ্যানকে অস্বীকার করে দারিকপা রচনা করেন নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র বয়ান :

কিং তো মন্তে কিংতো রে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীলেঁ দুলখ পরম নিবাণে ॥ (চর্যা ৩৪)

ঔপনিবেশিক আধুনিকতার এক কৃত্রিম বলয় এবং 'অপর বিশ্ব' চর্যাপদে খুঁজে নেয়া যায়। ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স পাত্তা দেয় না ছায়াকে। উপনিবেশিতরা ছায়ামাত্র তার কাছে। ফলে ঔপনিবেশিকদের জোরালো স্বরের কাছে উপনিবেশিতের মানবিক বিশ্ব শব্দহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু শব্দহীনতার মধ্যেও কোনো কোনো সিদ্ধা সহসাই শব্দমুখর হয়ে ওঠেন এবং সশব্দে নাকচ করে দেন ঊর্ধ্বতনের শাস্ত্রীয় প্রতিবেদন। আর্য ব্রাহ্মণ্যদের প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের রূপকল্পকে সহজিয়ারা সংশয়ের চোখে দেখেন :

> শাসকশ্রেণির ধর্মবিশ্বাস আর তাদের অধীন শ্রেণিগুলির ধর্মবিশ্বাস প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এক হলেও তাদের আকার ও চরিত্র পৃথক, এমন কি বিরোধী রূপও ধারণ করতে পারে। এই বিরুদ্ধতা থেকেই জন্ম নেয় সাবলটার্ন শ্রেণীর প্রতিরোধ। (গৌতম-পার্থ, ১৯৯৮ : ৫)

সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষের আদিম অসহায়ত্ব থেকে সৃষ্ট ধর্ম সহজিয়াদের কাছে এক অপার শূন্যতার ধারণা নিয়ে আসে। কঙ্কণপা ঘোষণা করতে এতোটুকু দ্বিধান্বিত নন যে, শূন্যের সঙ্গে শূন্যের মিলনে উদ্ভূত হয় ধর্ম, ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র কিংবা অবতার হিসেবে দেবতার আবির্ভাবের প্রাতিষ্ঠানিক প্রকল্পকে বাতিল করেন তিনি :

সূনে সূন মিলিআ জবেঁ।
সঅল ধাম উইআ তবেঁ ॥ (চর্যা ৪৪)

আগম-পুঁথি-শাস্ত্র মনেরই উদ্ভাবন, অলৌকিকতার ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে নিম্নবর্গের ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখার চেষ্টা উচ্চবর্গের কূটকৌশল। কিন্তু একমাত্র মনই যাঁদের শক্তি ও সম্বল তারা প্রত্যাখ্যান করেন উচ্চবর্গের এই বয়ান :

জো মণ-গোঅর আলাজালা।
আগম পোথী ইট্ঠা মালা ॥ (চর্যা ৪০)

মানবীয় অস্তিত্বের সংকটময় ধ্বস্ত বাস্তবতায় গড়ে ওঠা আধিভৌতিক বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যাদিষ্ট অবতার কিংবা প্রেরিত পুরুষের প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক ধারণাটি সাংঘর্ষিক। এই সংঘর্ষের প্রণোদনা প্রান্তিক মানুষের স্বভাবগত। উচ্চবর্গের অধীনতা এবং প্রতিরোধ – এই বিপ্রতীপ চৈতন্যে তাদের বসবাস। অর্থনৈতিক সম্পর্কের আভ্যন্তর

ধরনের কারণেই প্রান্তিক প্রাকৃতজন কেবল প্রতিস্পর্ধী অ্যান্টি-এস্টাবলিসমেণ্ট ধারায় যেতে পারে না।

চর্যাপদের মানবীয় বিশ্ব নৈঃসঙ্গ্য ও বিষাদে বিষণ্ন। সমাজবিন্যাসের অসমতার ঘায়ে বিপন্ন চর্যাকাররা প্রত্যাখ্যান করেছেন বস্তুজগৎকে। শখ করে কিংবা খেয়ালের বশে কেউ সাজানো বিশ্বকে অস্বীকার করে না, যাঁতাকলে পড়ে নিরুপায় কবিকুল চোখে দেখা জগৎকে মায়া বললেন, সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে শূন্যতার সাধনা করলেন। হেরুকবীণায় সেই শূন্যতার ধ্বনি শুনি :

> বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা।
>
> সূণ তান্তি ধনি বিলসই করুণা ॥ (চর্যা ১৭)

প্রতিষ্ঠানপীড়িত সমাজ মানবীয় অস্তিত্ব ও হৃদয়গতশক্তিকে উপেক্ষা দেখায়। কিন্তু বিকল্প ভাবাদর্শগত কাঠামো চর্যাপদের চিন্তনবিশ্বে স্বতন্ত্র জিজ্ঞাসা নিয়ে সক্রিয়। হৃদয় ও চিত্তশক্তিকে সহজিয়ারা নৈতিক পরিশুদ্ধির নিয়ন্তা মনে করে। ফলে ভাদেপার চারদিকের জগৎ এক মায়া-পৃথিবীতে রূপ নেয়। পাপ-পুণ্যের পরিসীমা কোথায় – প্রতিষ্ঠানগত শুষ্ক নৈতিকতা দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। ব্রাহ্মণ্য নৈতিক কাঠামো ও মতাদর্শের বিপরীতে ভাদেপা যে জগৎ অবলোকন করেন সেখানে প্রভুত্ববাদী প্রতিষ্ঠানের শাস্ত্রিক-নান্দনিক আচারের দাপট নেই, সেই জগৎ নিঃসীম শূন্যতার জগৎ – প্রান্তিকায়নের তীব্র বৈষম্যে ও নিষ্পেষণে পরিধিতে ঠাঁই নেয়া সিদ্ধাদের কাছে পারিপার্শ্বিক বস্তুবিশ্ব শূন্যতারই ছবি। উচ্চবর্গের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচার হলো একধরনের সাংস্কৃতিক প্রকল্প – এই আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক ধারণার বিপরীতে সিদ্ধাচার্যরা গড়ে তোলেন এক প্রতিস্পর্ধী আধিপত্যের (Counter hegemony of the mass) ইশারা। প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক নৈতিক মূল্যবোধের বিপরীতে ভাদেপার মতো সহজিয়াদের কাছে চিত্তশক্তির গুরুত্ব অনেকান্ত। পুঁজি ও বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণহীন প্রাকৃতজন আত্মবিবরে শূন্যতার জগৎ নির্মাণ ক'রে বঞ্চনার দুঃখমোচন করতে চায়। সহজিয়ারা মরমিয়া এবং বিচ্ছেদী – সামাজিক-অর্থনৈতিক–নান্দনিক পরিবৃত্ত থেকে এই বিচ্ছেদ তাদের দৃষ্টি থেকে মুছে দেয় আনন্দময় ফুল্ল পৃথিবী। ফলে ভাদেপার চারদিকে ঘনীভূত শূন্যতা জন্ম দেয় গভীর নৈরাশ্যের। সেই নৈরাশ্য ভাদেপাকে যেমন অধীন করে উচ্চবর্গের আবার বিপরীতে তাঁকে অস্তিত্ববোধে পৌঁছে দেয়। ফলে অধীনতার মতো প্রতিরোধও হয়ে ওঠে নিম্নবর্গের অনিবার্য লক্ষণ এবং উচ্চবর্গের প্রাতিষ্ঠানিক প্রকল্পকে প্রত্যাখ্যান করে ভাদেপা হৃদয় ও শরীরকেই গ্রহণ করে প্রতিস্পর্ধী আয়ুধ হিসেবে। তাই তাঁর কাছে পাপ-পুণ্যের আধার হয়ে ওঠে ব্যক্তির হৃদয় ও চিত্তশক্তি :

পেখমি দহদিহ সব্বহি সূন।
চিঅ বিহন্নে পাপ ন পূন ॥ (চর্যা ৩৫)

সহজ আনন্দে বিভোর হয়ে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ভাব ও অভাব ভুলে থাকার মধ্যে সমতার এক অপার অনুভূতি খুঁজে নেন সহজিয়া সিদ্ধারা। বস্তুগ্রাহ্য সমাজে বৈষম্যপরিকীর্ণ প্রভুত্ববাদী আচরণের শিকার এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বপ্নে তৈরি করে সর্বশূন্যতার জগৎ। বাস্তব জগতে কিছু প্রাপ্তির আশা নেই বলে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত করে যোগনিদ্রায় অভিভূত হয় কৃষ্ণাচার্য। ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ্যদের কাছে এই যোগসাধনা তাচ্ছিল্যের ব্যাপার বলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসীরা এই বন্ধনমুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে ব্যর্থ হয়। ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শের সমান্তরালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এই বিকল্প ভাবাদর্শ অধস্তনের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির স্মারক। কৃষ্ণাচার্যপা বলছেন :

স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সূণ।
ঘোরিঅ অবণাগবণ বিহুণ ॥
শাখি করিব জালন্ধরি পাএ।
পাখি ণ চাহই মোরে পাণ্ডিআচাএ ॥ (চর্যা ৩৬)

প্রান্তে বসবাস করে সরহপা জানেন নিঃশিকড় সমাজে জন্ম-মৃত্যু, বাঁচা-না বাঁচার মধ্যে পার্থক্য নেই। সমাজ নিয়ন্ত্রণে নেই অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণেও নেই ভূমিকা, কীটের মতো দেহরক্ষায় কোনো আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা নেই। শেকড়হীনতার এই নীরব অশ্রু সহজিয়াদের বুকে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আসে। জন্ম-মৃত্যু দুটোই তাদের কাছে সমান। বস্তুগত মোক্ষের স্বপ্ন দেখে যারা, মরণে তাদের ভয়। বেঁচে থাকার অনন্ত ঔষধির সন্ধান তারা করুক, সরহ সেই আকাঙ্ক্ষামুক্ত :

জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলে ণাহি বিশেসো ॥
জা এথু জাম মরণেরি সঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কংখা ॥ (চর্যা ২২)

চর্যাপদের মানবীয় বিশ্বে প্রান্তিকায়নের হতাশা ঘুরেফিরে আসে। বস্তুর প্রাপ্যতায় অধিকার নেই বলে চর্যাকারদের বিষয়-আসক্তিহীনতা দেখা দেয়। ভূমিপুত্রের জন্মের জন্য অনুকূল জায়গা নেই, আঁতুড় নেই। কুক্কুরী যা চান তার কিছুই তিনি পান না :

ফিটলিউ গো মাই অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু চাহম সো এথু নাহি ॥ (চর্যা ২০)

আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ হয় না বলে বস্তুবিবিক্ত শূন্যতার মধ্যে জীবনযাপনের আনন্দ খুঁজে নিতে হয়। ভুসুকুপার গৃহে সোনা-রূপা কিছুই থাকলো না, বস্তুহীন ঐশ্বর্যহীন রিক্ত বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আনন্দের অনুভবে পৌঁছান সিদ্ধারা। অস্তিত্বময়তা ও অস্তিত্বহীনতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, নেই জীবিত-মৃতের মধ্যে ভেদরেখা। নিঃস্বতার উপলব্ধিতে অফুরান স্বস্তির কুসুম রচনা করেন ভুসুকুপা :

সোণ অ রূঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ (চর্যা ৪৯)

প্রান্তিক অবজ্ঞাত জনগোষ্ঠীর কাছে চারপাশের সমাজ অমোঘ ও অপ্রতিরোধ্য মনে হয়। এই সমাজ কঠোরভাবে তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, চূর্ণ করে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে। বৈরী নিষ্ঠুর সমাজের প্রতাপকে ভয় পেয়েছে তারা কিন্তু তাকে প্রতিহত করার শক্তি বিকাশলাভ করেনি। অনুভূতিহীন এই সমাজবিধানকে পাল্টাতে ব্যর্থ হয়ে চর্যাপদের ব্রাত্যজন আঘাত করলেন নিজেকেই। তাঁরা সমাজশাসনের পরিবর্তে চিত্তশাসনের তাগিদ বোধ করলেন মানসপরিমণ্ডলে। জীবনসৃষ্টির প্রেরণা যেখানে রুদ্ধ জীবনের শূন্যতাকেই সেখানে মহিমান্বিত করলেন চর্যাকাররা। বেঁচে থাকার সহজ অভিব্যক্তিকে মনে হলো ভ্রান্তি ও মায়া। একারণে ভুসুকুপার চর্যায় মূষিককথাই পরিণত হয় মনুষ্যকথায় :

নিসিত আন্ধারী মূসার চারা।
অমিঅ ভখই মূসা করই আহারা ॥
মার রে জোইআ মূসা পবণা।
জেঁ ণঁ তুটই অবণাগবণা ॥ (চর্যা ২১)

মূষিকরূপ চঞ্চলচিত্তকে নাশ করে শূন্যতায় আশ্রয় নেয়ার পেছনে নিম্নবর্গের অক্ষমতা ও বেদনার ভারই মুখ্য বলে মনে হয়। তাঁদের সহজিয়া ধর্মচিন্তাও প্রাতিষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিবাদ। নিজস্ব ধর্মসংস্কৃতির শেকড় থেকে নিবিড় শক্তি সঞ্চয় করে অবজ্ঞাত মানুষ প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে তোলে। এই শেকড়ই তার নিজস্ব প্রান্ত, এখানেই তার শক্তি ও ঐতিহ্য। এই শক্তি নিয়েই তারা উচ্চবর্গের জন্মান্তর, পূর্বজন্ম, পুরাণ, আগম নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তীক্ষ্ণ সংশয় প্রকাশ করে। চর্যাপদের কবিতাগুলো একধরনের দ্বিরালাপ – সোচ্চার সংলাপ আর নিরুচ্চার প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়েই নিম্নবর্গের চেতনাবিশ্বটি উঠে এসেছে চর্যাপদে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পরিধির প্রতিবাদটি প্রকাশ্য নয় কিন্তু বিকল্প ভাবাদর্শ নির্মাণ করে সহজিয়া

মানুষেরা ব্রাহ্মণ্যদের আধিপত্যবাদী বয়ানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিবাদের স্পৃহা উগ্‌রে দেয়। আর্যের প্রভুত্ববাদী ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সমান্তরালে সহজিয়া প্রান্তজনের সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র ভাববিশ্ব চর্যাপদের কবিতায় নিবিড় হয়ে উঠেছে।

উচ্চবর্গের মতাদর্শের বিপরীতে সহজিয়া সিদ্ধারা এক প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী। ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলকতার মধ্য দিয়ে সমাজবিকাশের তত্ত্ব মার্কসে উচ্চারিত। রাষ্ট্রীয় অসাম্যের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধপ্রবণ সহজিয়ারা উচ্চারণ করে সমতার কথা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> অসাম্যের ভিত্তিতে গঠিত সমাজের মধ্যে থেকে এবং সমাজবিধায়কদের নিকট থেকে নানা অবিচার ভোগ করে সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ সম্ভবত সমতার আদর্শকে পুনরায় সরবে ঘোষণা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। (অরবিন্দ, ১৯৯৪ : ৮৮)

শূন্যতার যে সাধনা তাঁরা করেছেন সেখানে আপন-পরের ভেদ নেই। সুখ-দুঃখ, স্বপর-অপরে পার্থক্য করেন না সহজিয়ারা :

> দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জহ ইন্দিজালী।
>
> স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅল অনুত্তর মাণী॥ (চর্যা ৩৪)

সমতার এই চেতনায় সহজিয়ারা সাম্যবাদী ধারণায় ফিরে গেছেন অবচেতনে। জলবিম্বাকার এই জগতে মায়ার বিস্তার। জলকে যেমন বিভাজন করা যায় না, জল জলে মিশে গেলে কোনো বিভেদ তৈরি হয় না, তেমনি মন শূন্যতায় বিলীন হলে ভেদাভেদ থাকে না। ভেদহীন এই সাম্যাবস্থায় ভুসুকুপা উচ্চারণ করেন জলসংহিতা :

> জিম জলে পাণিআ টলিয়া ভেউ ন জাই।
>
> তিম মণ রঅণা রে সমরসে গঅণ সমাই ॥ (চর্যা ৪৩)

প্রান্তের বিষণ্ন বেদনা নিরন্তর যাপন করতে হয় বলে ভুসুকুপা জানেন বৈরী বিশ্বে তিনি নিঃসঙ্গ – স্বজন নেই তাঁর। কোথাও প্রত্যাশা নেই, নির্ভরতার সামান্য আশ্বাসও তাঁকে উদ্বেল করে না। যার আপন নেই তার আবার পর কোথায় – 'জাসু ণাহি অপ্পা তাসু পরেলা কাহি।' (চর্যা ৪৩) স্বজনহীন নিঃস্বতার অন্তর্বেদনা ভুসুকুপার মনোজগতে গভীর ক্ষতের কারণ। বিরূপ বিশ্বে তিনি নিয়ত একাকী।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাদর্পী উচ্চকোটির কেন্দ্রীয় শক্তি এবং কেন্দ্রচ্যুত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য ও বিভাজনের রেখাটি চর্যাপদে প্রবল। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো নির্মাণে এবং পুঁজির বিকাশে প্রান্তিক শ্রেণির কায়িক শ্রম গুরুতবপূর্ণ হলেও চর্যাবিশ্বের ইতিহাস নির্বিচার লুণ্ঠন ও বঞ্চনার ইতিহাস। ঔপনিবেশিক শক্তি অধিকৃত কিংবা উপনিবেশিত ভূখণ্ডে চাপিয়ে দেয় তাদের আধিপত্যবাদী মনোভাব ও পরিকাঠামো। বৌদ্ধিক-

রাজনৈতিক প্রকল্পের তাড়নায় উপনিবেশিত (Colonised) জনগোষ্ঠীর ভাব-ভাষা-সম্পদ-পুঁজির উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ঔপনিবেশিক শক্তি। একাধিক চর্যায় উঠে এসেছে সমকালীন প্রভুত্বমূলক উচ্চবর্গীয় সমাজের চালচিত্র। ভয়াবহ অসঙ্গত সমাজের এমন এক আবেষ্টনী চর্যায় পাওয়া যায় যেখানে দমনমূলক উচ্চবর্গের দাপটে একশ্রেণির মানুষ প্রান্তিকায়নের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ (চর্যা ৩৩)

শেকড়বিচ্ছিন্ন পরিধিতে বসবাসরত এই মানুষদের চারপাশে ছিল নীরন্ধ্র দানবীয় অন্ধকার। জ্ঞান-সত্য-প্রজ্ঞা-নীতি-বাস্তবতা ও মনুষ্যত্বের মহিমা বিপর্যস্ত বিচূর্ণ না হলে ব্যাঙ কীভাবে সর্পকে আক্রমণ করে, দোহন করা দুধই বা কীভাবে বাঁটে ফিরে যায়? বলদের প্রসব হওয়া আর গাভির বন্ধ্যা থাকা কিংবা দুর্জনের সাধু হিসেবে পরিচিতি পাওয়া সেই হন্তারক সময়কেই চিহ্নিত করে যখন শক্তি ও দাপট দেখিয়ে যে কোনো অসঙ্গতি-অন্যায়-ভ্রষ্টতাকে গ্রাহ্য করা যায়। সমাজপরিকাঠামোর ভিত্তিটি মৃত্তিকালগ্ন মানুষের দ্বারা গড়ে উঠলেও তারা নিঃশিকড়, নন-এলিট। বস্তুসমতার ভিত্তিতে জ্ঞাননির্ভর সমাজবিনির্মাণে যৌক্তিক পরম্পরা প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও চর্যাপদীয় সময় সেই ন্যায্যতা থেকে দূরবর্তী ছিল। পুঁজি-সম্পদ ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক বর্গের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল না বলেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন করা হতো। উড়ে এসে জুড়ে বসা ঔপনিবেশিক সেনরাই দখল করে জ্ঞানরাজ্যের কর্তৃত্ব, আর্যত্বের অহমিকা নিয়ে দাবি করে বসে বুদ্ধিবৃত্তিক পেটেন্ট। ফলে ঢেণ্‌ঢণপার পদে ছড়িয়ে থাকে নৈরাজ্যিক সময় ও লুণ্ঠনের সঙ্কেত :

জো সো বুধী সোহি নিবুধী।
জো সো চোর সোহি সাধী ॥
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জূঝই।
ঢেণ্‌ঢণ পাএর গীত বিরলে বূঝই ॥ (চর্যা ৩৩)

সাধারণ জনগণের যা স্বতন্ত্র সৃজনী প্রতিভার ফল, উচ্চবর্গ তাকে আত্মসাৎ করে চালিয়ে দিচ্ছে নিজেরই চিন্তা ও কাজ বলে। জ্ঞানীকে যখন নির্বোধ বলে উপস্থাপন করা হয় তখন স্পষ্টতা পায় এই বুদ্ধিবৃত্তিক পরস্বাপহরণের ইতিহাস। ধর্মভাবাচ্ছন্ন নিম্নবর্গীয় চৈতন্য এমন এক এলিয়েনেটেড বা বিচ্ছিন্ন সত্তায় উপনীত হয় যখন জড়জগৎ ও জীবজগতের কোনো সত্তা কিংবা বাস্তবের বা ভাবনার অন্তর্গত কোনো বিষয়কে তা ধারণার মধ্যে আনতে ব্যর্থ হয়। ফলে নিম্নবর্গের কাছে ঐহিকতা অলৌকিকতায় পরিণত হয়, মানবিক বিষয় পরিণত হয় দৈবে। ঐহিকতার

আতিশয্যে নিজের উদ্ভাবিত জিনিসকে নিম্নবর্গীয়রা নিজের বলে চিনতে পারে না, যা তার নিজের প্রতিভাজাত তাকে সে অন্যের কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করে। তাই তুলা ধুনে ধুনে নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠী নিরবয়ব অস্তিত্বে পৌঁছায়। উচ্চবর্গের হাতে চলে যায় শ্রমের ফসল। ইতিহাস হলো উচ্চবর্গের প্রভু-সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। উচ্চবর্গের ইতিহাসে আদিবাসী, শ্রমজীবী প্রাকৃতজন, নারীদের উপস্থিতি প্রায় শূন্য। সহজিয়া নিম্নবর্গীয় সিদ্ধাদের পদে তাই ঘুরেফিরে আসে তুচ্ছ বৃত্তিজীবী নরনারীর কথা। উচ্চ-নিম্নের এই বৈষম্য, প্রভুত্ব ও অধীনতার এই দূরত্ব এবং কেন্দ্র ও পরিধির এই দ্বন্দ্ব কাহ্নপার মনোজগতে তৈরি করে অনিবার্য আকল্প :

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাসি বামহণ নাড়িআ ॥ (চর্যা ১০)

আর্য ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যে গড়ে ওঠা নগরে নন-এলিট নিম্নবর্গ তথা ডোম্বিরা প্রান্তিকায়নের চূড়ান্ত রেখায় পৌঁছে, তাই তাদের বসতি গড়ে উঠেছে নগরের বাইরে। নগর-পরিত্যক্ত হলেও নিম্নবর্গের শক্তির আসল তেজ লুকিয়ে থাকে আভ্যন্তর ক্রোধে এবং তার আকস্মিক বিস্ফোরণে। ডোম্বির ঘরে আগুন লাগলে তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকেও ছাড় দেয় না। পরিধিতে ঠাঁই নেয়া নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সূত্রেই আপসকামী হতে হয় কিন্তু তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা মানবীয় অগ্নি দেবালয় কিংবা রাজতক্ত সবকিছুকেই ভস্মীভূত করে। অধস্তনের শক্তি নাড়িয়ে ধস্ত করে উচ্চকোটির ক্ষমতার প্রতীককে :

দাঢ়ই হরিহর বামহ্ ভট্টা।
ফীটা হই ণবগুণ শাসন পট্টা ॥ (চর্যা ৪৭)

ডায়াসপোরার (Diaspora) মানবীয় আখ্যান চর্যাপদকে বৈশ্বিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে। খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে ইহুদি জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে ডায়াসপোরার যে অমোচনীয় বেদনা সূচিত হয়, দেশকালের পরিসীমা ছাড়িয়ে সেই ইতিহাস বিশ্বমানবিকতার ইতিহাস হয়ে ওঠে। ভূমিহীন উদ্বাস্তু মানুষের দেশত্যাগের যন্ত্রণা চর্যাপদে ইতিহাসের গভীর সঙ্কেত নিয়ে উপস্থিত। ইতিহাসের প্রাচীন বেদনা নতুন তীব্রতা নিয়ে কালান্তরে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। চর্যাপদের মানবিক বিশ্ব সেই অশ্রুভারাতুর মানবগোষ্ঠীর রোদন ও অস্তিত্বহীনতার যন্ত্রণায় কাতর। ভুসুকুপা ও কাহ্নপার পদে উঠে এসেছে বাস্তুচ্যুত স্বদেশউন্মূলিত মানুষের অবিরল আর্তনাদের মর্মযন্ত্রণা। ভুসুকুপার চর্যায় হরিণ শিকারের যে বিখ্যাত চিত্র ফুটে উঠেছে সেটি আসলে অবরুদ্ধ মানবঅস্তিত্বের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার সঙ্কেত। প্রান্তিক অন্ত্যজ ভুসুকুপা তথা নিম্নবর্গকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চারদিকে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ, চক্রান্ত আর বিভীষিকা। প্রতিরোধহীন ভুসুকুপা এই দানবীয় বৈরিতার সামনে নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। তার জ্ঞান-প্রতিভা-সৌন্দর্য আর প্রজ্ঞা উচ্চবর্গের ঈর্ষার কারণ, নিম্নবর্গের বিকল্প শক্তিকে বরদাস্ত

করতে নারাজ ব্রাহ্মণ্যশ্রেণি। তাই ভুসুকুপা তথা নিম্নবর্গের চারদিকে তৈরি হয় হিংস্র কুটিল মারণজাল। আত্মরক্ষায় অক্ষম নিম্নবর্গ তথা হরিণ আহারবিহার ত্যাগ করে। মাৎস্যন্যায়ের এই অরাজক ছবিটি ধরা পড়েছে ভুসুকুপার অবিস্মরণীয় এই পদটিতে :

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস ॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী ॥
তিণ ন ছুবই হরিণা পিবই ন পাণী ।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী ॥ (চর্যা ৬)

চারপাশ থেকে ধেয়ে আসা অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের মুখে হরিণ অরণ্যের অধিকার হারায়। হরিণী মিনতি জানায় নিজের বনছেড়ে হরিণ যেন পালিয়ে যায় অন্য আশ্রয়ে। ইতিহাসের কালচক্রে নাম-না-জানা স্বদেশচ্যুত মানুষের মতোই ঠিকানাহীন ভবঘুরের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয় হরিণরূপী ভুসুকুপা। এভাবেই চক্রাকারে ফিরে ফিরে আসে ডায়াসপোরার ট্রাজিক বৃত্ত :

হরিণী বোলই সুণ হরিণা তো।
এ বণ ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥ (চর্যা ৬)

আশ্রয় ও অস্তিত্বের এই নিরন্তর অনিশ্চয়তা কাহ্নপার মনোজগতেও ছায়া ফেলে। আলি-কালির বাট রুদ্ধ করার মতোই চারদিকের আশ্রয় যখন সঙ্কুচিত অবরুদ্ধ হয়ে আসে তখন কাহ্নও দেখেন জগৎ পরিচ্ছিন্ন, কোথাও গিয়ে নিরাপদে বাস করার মতো ঠাঁই তাঁর নেই। বসতিহীন নিরাশ্রয় কাহ্নপা উদ্বাস্তু শরণার্থীর মতো মর্মবেদনা ঘোষণা করেন :

কাহ্ন কহি গই করিব নিবাস।
জো মণ গোঅর সো উআস ॥
তে তীনি তে তীনি তীনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্ন ভব পরিচ্ছিন্না ॥ (চর্যা ৭)

নিম্নবর্গীয় জীবনে ও সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির অন্তহীন শক্তি ও সম্ভাবনা ভিন্ন এক অভিজ্ঞান হয়ে ধরা দেয়। উচ্চবর্গের ধর্মীয় সংস্কৃতি নিরঙ্কুশ আধিপত্য দাবি করে লোকঐতিহ্য-সংস্কৃতির ওপর। উচ্চবর্গের প্রাতিষ্ঠানিক ভাবাদর্শের চাপে এই সংস্কৃতি ভারাক্রান্ত হলেও সাবলটার্ন শ্রেণি এই ঐতিহ্যের আধার থেকেও সঞ্চয় করে

প্রতিরোধের অনিরুদ্ধ তাড়না। সমগ্র চর্যাপদের আভ্যন্তর বিন্যাসে লোকঐতিহ্য ও কার্নিভ্যালের এক অমেয় অপ্রতিরোধ্য রূপ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। মিখাইল বাখতিন কার্নিভ্যাল বা লোকউৎসবকে এক সাহিত্যিক কৃৎকৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আন্তোনিও গ্রামসি লোকজীবনের উল্লাস-হুল্লোড়-রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক-কথকতা-পরিহাস ও বিনোদনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন নন-এলিট নিম্নবর্গের প্রত্যাখ্যান-প্রতিবাদের বিশিষ্ট ভঙ্গি। নিম্নবর্গকে গৌণ অপ্রাসঙ্গিক করে রাখার কূট ইচ্ছায় জাতীয় ঐতিহ্যের অনিবার্য অনুষঙ্গ লোকঐতিহ্যকে উচ্চবর্গ প্রত্যাখ্যান করে, উচ্চবর্গের বৌদ্ধিক-রাজনৈতিক প্রকল্পের কাছে লোকসংস্কৃতি লঘু ঐতিহ্য বলে উপেক্ষিত হয়। কার্নিভ্যালের উৎসবগুলোতে লোকমানুষের শরীরী অভিব্যক্তি এবং পেশিবহুল দেহ প্রদর্শনকে উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকে। কিন্তু লোকসংস্কৃতি উচ্চবর্গের অভিজাত বৌদ্ধিক সংস্কৃতির বিপরীতে হয়ে ওঠে এক বিকল্প নন্দন। রঙ্গ-মজা-কৌতুক-নৈরাজ্যিক দেহভঙ্গিমাকে প্রাকৃত নিম্নবর্গ উদযাপন করে অঢেল উল্লাসে এবং মূল স্বরের সমান্তরালে তুলে ধরে বিবাদী স্বর। চর্যাপদের একাধিক কবিতায় লোকউৎসবের বৈচিত্র্যময় রূপ আলো-শক্তি ও প্রাচুর্য ছড়িয়েছে :

এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ি ।
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি ॥ (চর্যা ১০)
তু লো ডোম্বী হউঁ কাপালী ।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥ (চর্যা ১০)
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআঁ ॥ (চর্যা ১৯)
আধরাতি ভর কমল বিকসিউ ।
বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উল্লসিউ ॥ (চর্যা ২৭)

চর্যাপদের ভাষাকাঠামোর মধ্যেও প্রাকৃত মানুষের স্বতন্ত্র মনোভঙ্গির প্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ্যশক্তির দরবারকেন্দ্রিক সংস্কৃত ভাষার বিপরীতে চর্যাকাররা সৃষ্টি ও চর্চা করেছেন দেশজ ভাষারীতি। সেন রাজসভার ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধিকমণ্ডলি সংস্কৃত ভাষাকেই কাব্যচর্চার মাধ্যম বা অবলম্বন করেছেন কিন্তু 'বহুল চর্চায় সাধনসঙ্গীত হিসেবে নিত্য ব্যবহারের ফলেই তথা স্থানিক লোকব্যবহারে চর্যার ভাষা শিথিলগ্রন্থি ও সরল হয়েছে।' (আহমদ শরীফ, ১৯৭৮ : ২৫৫) চর্যার কবিকুল লোকজীবনের ভাষাকেই অন্তরঙ্গ চৈতন্যে ধারণ করেছেন এবং এই লোকভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। একজন গবেষকের কথায় বলা যায় – 'এই ভাষানির্মিতির পেছনেও ক্রিয়াশীল ছিল আধিপত্যবাদবিরোধী চেতনার ভূমিকা।' (দেবাশিস, ২০১০ : ৮৮) বহিরাগত সেনদের ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর এই স্বতন্ত্র

বয়ান উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ। বিষয়বৈশিষ্ট্যে ও ভাষানির্মিতিতে চর্যাপদ এই উপনিবেশোত্তর চেতনার শক্তিমান পূর্বসূরি।

তথ্যনির্দেশ

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৯৯২)। *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)*, ৭ম সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণি, কলিকাতা

২. মাহবুবুল হক (২০০৯)। *চর্যাগীতি পাঠ*, প্রথম প্রকাশ, পাঞ্জেরী পাবলিকেশনস লি., ঢাকা

৩. তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৯৭)। *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

৪. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৯৯৮)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা

৫. অরবিন্দ পোদ্দার (১৯৯৪)। *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

৬. আহমদ শরীফ (১৯৭৮)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (পনেরো শতক অবধি), প্রথম প্রকাশ, বর্ণমিছিল, ঢাকা

৭. দেবাশিস ভট্টাচার্য (২০১০)। *বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা*, প্রথম প্রকাশ, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা